মননশীল সত্যসন্ধানী সমালোচক, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় (১৯২০ - ২০০৮)

গজেন্দ্র কুমার ঘোষ

অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় অধুনা বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিরোধানে শোকাহত চিত্তে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকেই এই ব্যতিক্রমী মানুষটির গুণ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তাঁদের লেখা থেকে নাতিদীর্ঘ কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে তার প্রতিভার কিছু রূপরেখা এখানে তুলে ধরেছি। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের সুদীর্ঘ তিন দশকের বেশী সময় - অনেক সময় সাক্ষাতে অনেক সময় পত্রালাপে আমি তাঁকে পেয়েছি, সে বিষয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করাই আমার এই লেখার উদ্দেশ্য। প্রবন্ধ লেখকরা সাধারণতঃ কোন বিষয় অনেক তথ্য পড়ে, সূত্র উল্লেখ করে নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। আমি আমার এই লেখার ভূমিকায় শিবনারায়ণ রায় সম্বন্ধে লেখকের নিজের ভাষাতেই তার বাল্য কাল সম্বন্ধে ''জিজ্ঞাসা'' (বিংশ বর্ষ, ১৪০৬) থেকে এই উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি—

''প্রথমেই স্বীকার করব যে পরিবারে আমি জন্মেছি এবং যে পারিবারিক পরিবেশে আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তাতে বই পড়ার মতই লেখাটাও আমাদের জীবনে প্রায় ডাল ভাতের সামিল ছিল। আমার বাবা ছিলেন বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী, সংস্কৃতের জগতে তাঁর বাস, প্রাচীন ভাষা সাহিত্য ইতিহাস ব্যাকরণ সম্পর্কিত বেশ কিছু মূল্যবান বই লিখেছেন, এক সময়ে পণ্ডিত মহলে যাদের যথেষ্ট কদর ছিল। দাদা চর্চা করেছেন প্রাকৃত বৌদ্ধ ধর্ম এবং প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে। দুই দিদির মধ্যে একজনের বিষয় দর্শন, অন্যজনের সংস্কৃত। মা'র ভাষাজ্ঞান বাংলাতেই সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু কাশীরাম দাস থেকে মানকুমারী বসু তাঁর মুখস্থ, নিজও বিস্তর কবিতা লিখেছেন (যদিও প্রকাশের কথা কখনও তাঁর মনে আসে নি)। সুতরাং আমিও যে লিখব এটাই স্বাভাবিক।" 'জার্নাল থেকে— কেন লিখি।— শিবনারায়ণ রায়। সৌজন্য ? জিজ্ঞাসা)

(সংযোজন ঃ ১৯২১ সালে, বরিশাল জেলার রায়ের কাঠি জমিদার বংশে তার জন্ম।)

শিবনারায়ণের রাজনীতি অথবা তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও উপলব্ধির জগৎটাকে বুঝতে চাইলে মানবেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রদর্শন অতি সংক্ষেপে হলেও আমাদের কিছুটা বোঝা দরকার। আমরা জানি, শিবনারায়ণের ভাবনা - চিন্তার জগতে ডারউইন, মার্কস, ফ্রায়েড, রাসেল, সাত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু ভাবুক ও মনীষীরাই উপস্থিত আছেন। এঁদের কাছে তিনি ঋণী, এ ঋণ তিনি স্বীকারও করেছেন। কিন্তু একথাও সত্য, তাঁর ভাবনাচিন্তার পূর্ণতা ও পরিণতি সৃষ্টিতে বিপ্লবী - দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বাধিক। এই বিরাট পুরুষটির বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁর সমাজ ও ইতিহাসের প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যাখ্যা ও বিচার - বিশ্লেষণ, তার বিশ্ববিদ্যার অনুশীলন ও বিস্ময়কর আত্তীকরণ ক্ষমতা, ইউরোপীয় বেনেসাঁসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও তার শাশ্বত মূল্য নির্ণয়ে তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিপাত এবং তাঁর অপরাজেয় স্বাধীন দৃপ্ত - ব্যক্তিত্ব, তাঁর মৌলিক প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি শিবনারায়ণের মতো মুক্তবুদ্ধি মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করেছে এবং গভীরভাবে প্রভাবিতও করেছে। আমার মতে, ইংরেজি বাংলায় শিবনারায়ণের রাজনীতিবিষয়ক অসংখ্য নিবন্ধ - প্রবন্ধের কথা মনে রেখেই বলছি, 'মৌমাছিতন্ত্র' বইটি তার রাজনীতির চর্চার শ্রেষ্ঠ ফসল। এই বইটির পরিচয় দেওয়ার আগে শিবনারায়ণের বৃহত্তর বিচরণভূমি সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার মনে করি। সাহিত্য - শিল্পের জগতে বিচরণেই তিনি অনেক বেশি আনন্দ পান, তিনি নিজেও বোধহয় মনে করেন, এই তাঁর স্ব-ভূমি। তিনি রাজনীতি সচেতন, কিন্তু রাজনীতি সংলগ্ন নন। বিশ্ব সাহিত্যের অথবা শিল্প - জগতের এমন কোনও স্মরণীয় স্রষ্টা নেই যাঁর সৃষ্টির সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন তিনি করেননি। শেকসপিয়র, মিল্টন, গ্যেটে, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র নজরুল থেকে আধুনিক কালের এলিয়ট, অডেন, স্পেন্ডার, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, সুভাষ শঙ্খ, শক্তি পর্যন্ত কেউ তাঁর তীক্ষ্ণ অথচ গভীর দৃষ্টির ও বিচার - পরিধির বাইরে ছিলেন না। তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন টমাস মান, সার্ত্র, কাম্যুর সৃষ্টিলোকে, আবার ব্যতিক্রমী বিরল রসবোধে বিচার করেন শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর বিচার - বিশ্লেষণ বহুক্ষেত্রেই আবিষ্কার, আমরা নতুনভাবে তাঁদের দেখতে পাই। ইউরোপীয় এবং এ-দেশীয় চিত্রশিল্প, বিশেষ করে আধুনিক চিত্রশিল্প সহজেই তাঁর বুদ্ধিগোচর হয়ে ওঠে। সম্ভাবনাময় তরুণ কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকের প্রতি তাঁর সহৃদয় মনোভাব সুবিদিত। জিজ্ঞাসা-র বহু তরুণ কবি ও গল্পলেখক তাঁর সহৃদয়তার সাক্ষী। আত্তীকরণ' –এই নিবন্ধের লেখক স্বরাজব্রত সেনগুপ্ত। দৈনিক স্টেটসম্যান, বিচিত্রা, রবিবাসর, ১৬ই মার্চ ২০০৮ সংখ্যা, একই সংখ্যা থেকে-নিচের উদ্ধৃতি 'শিবনারায়ণ এক ব্যতিক্রমী মনীষার নাম' লিখেছেন গোলাম মুরশিদ)।

কিন্তু অতগুলো বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের থেকেও তাঁর বড় গুণ ছিল স্বাধীনভাবে চিন্তা করা। প্রচলিত পথে চলতে আদৌ রাজি ছিলেন না তিনি। আপ্তবাক্যে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। সবাই যা স্বীকার করে নিয়েছে, তাকেই মেনে নিতে

হবে— এমন ধারণা তিনি রীতিমতো ঘৃণা করতেন। চিরদিনের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে প্রশ্ন করার জন্যে যে সৎসাহস দরকার, তাও ছিল তাঁর অপর্যাপ্ত পরিমাণে। সাধারণত যাঁদের পণ্ডিত বলা হয়। তাঁদের সঙ্গে তাই তাঁর মতের মিল হত না।

একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের কাছে গরু যেমন দেবতা, শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে রবীন্দ্রনাথও একজন দেবতা। যাঁর সবকিছুই প্রশ্নের উর্ধে।

তিনি অবশ্য দৈবধর্মের পরিবর্তে তাঁর যৌবনে, কিছুকালের জন্য মার্কসের ইহলৌকিকতার তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। মার্কসের দর্শন যে অন্যসব দর্শনের অভিনব মাপকাঠি, তাতে তাঁর কখনও সন্দেহ হয়নি। কিন্তু মার্কসবাদী দর্শন, আর রাজনীতিতে তার প্রয়োগ—এ দুয়ের মধ্যে তিনি ঐক্য দেখতে পাননি। মার্কসের নামে গলা - কাটা রাজনৈতিক পন্থাকেও তিনি সমর্থন করতে পারেনি। তার ওপর ১৯৪৬ সালে তিনি বিরাট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সংস্পর্শে আসেন। মানবেন্দ্রনাথ খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ানে কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক হিসেবে বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন। তবে স্তালিনের মানবতাবিরোধী রাজনৈতিক পন্থা দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর কাছে মার্কসীয় দর্শন মানুষের জন্যে, মার্কসীয় দর্শনের জন্যে মানুষ নয়। তিনি তাই বিশ্বাস স্থাপন করেন মানবতায়। যার নাম তিনি দিয়েছিলেন র‍্যাজিক্যাল হিউম্যানিজম। এই র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমে যাঁরা প্রথম দিকে দীক্ষিত হন, শিবনারায়ণ রায় ছিলেন তাঁদের একজন। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই দর্শনে তিনি অবিচল ছিলেন।

কিন্তু শিবনারায়ণ বহুবার রবীন্দ্রনাথের বহু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। শুচিতার নামে রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ এবং জীবনের একটা বিরাট অংশকে জানতে চাননি অথবা তার স্বাদ নিতে সমর্থ হননি—শিবনারায়ণ তার নিন্দা করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণে গুরুদেবের ভক্তরা মার - মার কাট - কাট করে তেড়ে এসেছেন তাঁর দিকে। কিন্তু সে হই চই - এর মুখে তাঁর বক্তব্য থেকে সরে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর নিজের নামের ওপর দু-দুটি প্রধান দেবতা ভর করে থাকলেও, ধর্মের প্রতি তাঁর বিলকুল আস্থা ছিল না। কারণ, ধর্মও গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা, সমবেত হুক্কা হুয়া। ধর্ম অন্ধ অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই না। তাঁর কাছে বরং গ্রহণযোগ্য ছিল নিজের যাচাই করা সত্য। যুক্তি - বুদ্ধি দিয়ে উপনীত নিজের সিদ্ধান্ত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাই তাঁর কাছে শ্রদ্ধেয় বস্তু। নিজের স্বাধীন এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই তিনি উভয় বাংলায় এ যুগের একজন প্রধান ভাবুক এবং চিন্তক হতে পেরেছিলেন।

এক ভাষাভাষী এবং একই সংস্কৃতিতে লালিত হওয়া সত্ত্বেও এই দুই বাংলার মধ্যে যোগাযোগের যে অভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তা তাঁকে সব সময়ে পীড়িত করতো। তিনি তাই দুই বাংলার বুদ্ধিজীবী এবং কবি - সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কলকাতাতার পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের কবি - সাহিত্যিকদের সম্পর্কে লিখে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের কাছে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার বিরাট দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এভাবে তিনি ওয়ালিউল্লাহ, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান প্রমুখ সাহিত্যিককে পশ্চিমবঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে বাংলাদেশের সাহিত্য এবং মননশীলতার চর্চা নিয়েও লিখেছেন বারবার। তাই এই ভূমিকা অসাধারণ। অসাধারণ এই জন্যে যে ৩৭ বছর আগেই ধর্মভিত্তিক দেশ পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে গিয়ে ভাষাভিত্তিক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনও বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের মতো গভীর আগ্রহ পশ্চিমবঙ্গে আর কারও তৈরি হয়েছে কিনা, সন্দেহ করি।" (উদ্ধৃতি ? গোলাম মুরশিদ)

(সৌজন্য ঃ বিচিত্রা, দৈনিক স্টেটসম্যান, কলাকাতা, ১৬ই মার্চ ২০০৮)

[দ্রষ্টব্য ঃ এই নিবন্ধে সূচনা পর্বে এবং উপসংহারে সংযোজিত চারটি উদ্ধৃতি যথাক্রমে — শিবনারায়ণ রায়, স্বরাজব্রত সেনগুপ্ত, গোলাম মুরশিদ এবং তসলিমা নাসরিন।]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই পঃ বঙ্গের অনেক ফোক শিল্পীর এবং বুদ্ধিজীবীরা অতিথি হিসাবে বাংলা দেশে গিয়েছিলেন। কলকাতা ফিরে অনেকেই পত্র পত্রিকায় রণক্লান্ত বাংলাদেশ সম্বন্ধে নষ্টালজিয়া মূলক অনেক আকর্ষণীয় নিবন্ধ লিখে ছিলেন। আমার প্রবাস জীবনে সেই সব লেখা পড়ার একান্ত কৌতুহল জাগতো। লিটল ম্যাগাজিনের তখন এতো প্রচার ছিল না। ''দেশ'' পত্রিকায় আমি গ্রাহক ছিলাম তখন। তখন বাংলাদেশ থেকে শিবনারায়ণ রায় বাংলাদেশের সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের তুলে ধরে একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছিলেন ''দেশ'' পত্রিকায়। নিবন্ধটি আমি জিরখস্ করে আমার বিশেষ সংগ্রহের 'ফাইল' সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। খুঁজলে এখনও পাওয়া যাবে। সেই লেখাটিতে তিনি ওয়ালিউল্লাহ, শামসুর রহমান থেকে হাসান আজিজুল হক প্রমুখ অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য পাঠক পাঠিকা মহলে পরিচিত করে দেন। আমার কাছে তখন বাংলাদেশের অধুনা সাহিত্য সম্বন্ধে এক নতুন দরজা খুলে গেলো। এর পর তিনি বহুবার বাংলাদেশে গিয়েছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক নিবন্ধ লিখেছেন, তাঁর নিজের এবং অন্য পত্রিকায় তাঁর

নিজস্ব বিখ্যাত বাংলা সাহিত্য পত্রে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন, বাংলা দেশের খ্যাত অখ্যাত লেখক লেখিকাদের নিয়ে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অকৃত্রিম সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন। বিগত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু ঘটে গেলো নিঃশব্দে নিরবে। সচেতন ভাষাশিল্পী শিবনারায়ণ রায় তাঁর আত্মপরিচয়ের ভূমিকায় লিখে ছিলেন এই শেষ লাইন - ''আমার মৃত্যু যেন ঘটে গাছের পাতাঝরার মতো, নিঃশব্দে, সহন অনার্ত নিষ্ক্রমণে।''

তাঁর এই ''অনার্ত নিষ্ক্রমণের'' কয়েক দিন আগেই তাঁকে আমি একটি ফোন করে ছিলাম, অধ্যাপক অম্লান দত্তের খোঁজ করার জন্য। আমার লেখা ''নোবেলের নেপথ্যে ও নোবেল পুরস্কার'' বইটি অধ্যাপক দত্তকে উৎসর্গ করা হয়েছে। আমার সুইডেনে আসার সময় হয়ে এসেছে। তিনি তাঁর খবর জানেন কিনা জানার জন্য। এখানেই আরো একটু ট্রান্সষ্ট্র্যোমারের ''অপর রহস্য'' বইটি আমি অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের নামে উৎসর্গ করেছিলাম।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ে। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের ৮০ তম জন্মদিন পালন করা হয়েছে পশ্চিম বাংলা আকাদেমিতে। সেদিন তাঁর হাতে একটি ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে বলেছিলাম— ''আপনি আমার চেয়েও একদিন বেশি বাঁচুন, এই আমার প্রার্থনা।'' আমার আবেদনটি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন নি। পুনরাবৃত্তি করতে হলো। আমি চেয়েছিলাম আমার জীবিতকালটা যেন তিনি বেঁচে থাকেন। আমার আবেদন তিনি না রেখেই চলে গিয়েছেন নিঃশব্দে নিরবে।

যতদূর মনে পড়ে, অধ্যাপক রায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, ১৯৮৫ সালে। অবশ্য পত্রে যোগাযোগ আরো আগে। তাঁর লেখা চৌদ্দটি চিঠি আমি খুঁজে পেয়েছি। আরো চিঠি তিনি লিখেছেন, আমার চিঠির উত্তরে। তিনি প্রথম চিঠিটি লিখেছেন ১৯৮৩ সালে ২৩ শে সেপ্টেম্বর। মনে হয় আমাকে সেইটি তাঁর প্রথম লেখা চিঠি। এবং 'জিজ্ঞাসা' সাহিত্য পত্রে পরিচিতি দিয়ে - তিনিই আমাকে প্রথম চিঠিটি লিখেছেন। আমি যেন জিজ্ঞাসার গ্রাহক হই এবং আমার পরিচিত অন্যান্য বাঙালি পাঠক পাঠিকাদের এই পত্রিকার দিকে আকৃষ্ট করি। তাঁর পত্র পাওয়ার পরেই আমি ছাড়া ও বিদেশ এবং দেশে আরো তিন জন পাঠককে আজীবন জিজ্ঞাসার গ্রাহক করে দিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৮৫র জুন মাসের ভীষণ গরমে। 'জিজ্ঞাসা'র দপ্তরে তিনি ছিলেন, আদুল গায়ে পাখার নিচে বসে প্রুফ দেখছেন। আমাকে দেখে খুবই খুশি হয়ে বললেন তিনি ১৯৮২ সালে আমাকে প্রথম দেখেছেন মহাবোধি সোসাইটি হ'লে, সুইডেন থেকে প্রথম প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠানে।

তখনো তাঁর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি। যত দূর মনে হয় তিনি আমাদের অনুষ্ঠানের কোন আমন্ত্রণপত্র না পেয়েই কৌতুহল বশতঃ বিনা আমন্ত্রণেই আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ছিলেন। আনন্দবাজারের সভা সমিতির ঘোষণা দেখে। সেই প্রথম সাক্ষাতে তাঁর সঙ্গে বসে বেশ কয়েকটি ফটো তোলা হয়েছিল। আদুল গায়ে তার মেদহীন দেহের ছবিটির পাশে বসে ছবিটির একটি কপি খুঁজে পেলাম না। আজ এই নিবন্ধের সঙ্গে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। ১৯৯৫ সালে নিউ ইয়র্ক বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে তিনি গিয়েছিলেন সুইডেন থেকে। সেই বছর নিউইয়র্কে উত্তর আমেরিকার ১৫ তম বৎসর বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবে দেশের শুধু শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনের স্বনামধন্য ব্যক্তিরাই উপস্থিত ছিলেন না, সেই বিশেষ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাংলার কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও। যেমন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী জ্যোতি বসু, বর্তমান কেন্দ্রিয় সরকারের স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জী এবং সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। অবশ্য সিদ্ধার্থ রায় তখন ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমেরিকায় নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় একদিন একটি সাহিত্য সেমিনারে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমেরিকায় বাঙালি মহিলা বা হাউস ওয়াইফদের নিয়ে একটি মন্তব্য করেন। যে বিষয়ে তিনি অজ্ঞাত ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেন, বাঙালি গৃহবধূরা আমেরিকায় তাঁদের অবসর সময়টা সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কাজ কিছু কি করেন? সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের সমস্বরে উত্তর তারা বাংলা নাটক, নাচ, গান, তাছাড়া ছোট বড় সব রকমের রুজি রোজগার করেন। অধ্যাপক রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রশ্নটি ফিরিয়ে নেন। নিঃসংকোচে তার না জানার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি অপ্রিয় সত্যকে যেমন প্রকাশ করতে ভয় পান না, তেমনি ভুলের সংশোধন করতেও সংকোচ বোধ করেন না।

মৃত্যুর মাসখানেক আগে নবকুমার শীলের লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালার বাৎসরিক সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন প্রধান বক্তা হিসাবে। সেখানেও তিনি কুণ্ঠিত বোধ করেন নি বলতে, যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন করেন, তাঁদের যোগ্যতা রাখে না। তাছাড়া আজকের লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক এবং কবি ও লেখকরা বিদেশী সাহিত্য, ক্ল্যাসিক অথবা আধুনিক কোনটাই তাঁরা পড়াশুনা করে না।

অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের শেষ ডাকা সাংস্কৃতিক যে সভাটিতে তাকে শেষ বারের মত দেখেছি এবং তার বক্তব্য শুনেছি তা হলো ''জিজ্ঞাসা'' দপ্তরে, এম, এন রায়ের জীবনীর শেষ সংস্করণটি প্রকাশ অনুষ্ঠানে। সভাপতি ছিলেন অম্লান দত্ত।

সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিদগ্ধ শ্রোতা। আমার মনে হয়, এটিই তার শেষ বক্তব্য শুনেছি।